ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

রাজশাহী অঞ্চল: একটি ভৌগোলিক পরিচিতি

*মঈন উদ্দীন আহমেদ

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের 'উত্তরাঞ্চল' বলতে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগকে বুঝানো হয়। অঞ্চলটি প্রাচীন জনপদ– বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। অঞ্চলটির একদিকে যেমন রয়েছে সমৃদ্ধ মানবেতিহাস, তেমনি রয়েছে ভূ-প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা। হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি, তিস্তা প্লাবনভূমি, গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি, লোয়ার আত্রাইঅববাহিকা, প্লিস্টোসিন কালের উঁচুভূমিসহ বহু নদ-নদী, বিল-জলাশয়সমৃদ্ধ ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ এই জনপদকে বৈচিত্র্যময় করেছে। প্রভাব ফেলেছে অধিবাসীদের জীবন-জীবিকায়। মূলত রাজশাহী অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের এই বিশিষ্টতা অত্র নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

রাজশাহী নামকরণ

রাজশাহী অঞ্চল নিয়ে আলোচনার শুরুতেই এর নামকরণ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। 'রাজশাহী' শব্দটির রাজ সংস্কৃত রাজন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, আর ফারসি শাহ্-এর বিশেষণ শাহী, যার অর্থ– রাজকীয় কিম্বা রাজা বা রাজ্যসম্বন্ধীয়। অতএব রাজশাহীর শাব্দিক অর্থ করা যেতে পারে– রাজার রাজকীয়তা অথবা রাজা ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়। সংস্কৃত ও ফারসির মিশ্রণজাত শব্দটি আমাদেরকে চমৎকৃত করে। আবার অঞ্চলটির রাজশাহী নামকরণ কখন কীভাবে হয়েছে, তা জানারও কৌতূহল জাগায়। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রামাণিক কোন তথ্য নেই; নির্ভরযোগ্য লিখিত ইতিহাসও অনুপস্থিত। অঞ্চলটি বিভিন্ন সময় হিন্দু-মুসলিম রাজা, সুলতান, জমিদার দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে এমন নামকরণ হতে পারে। ঐতিহাসিক ব্লকম্যান মনে করেন, ভাতুরিয়ার[১] পরাক্রান্ত সামন্ত কংস বা গণেশ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর হয়েছেন রাজকীয় বা শাহী। তাঁর মতে,

> হিন্দী 'রাজ' ফারসী 'শাহী' যেমন মাহমুদশাহী বারবাকশাহী, তেমনই হিন্দুর রাজ মুসলমানের শাহী– রাজশাহী, অর্থাৎ হিন্দু রাজা হইয়া মুসলমানের সিংহাসনে শাহ্ হইয়াছিলেন।[২]

মুসলিম সিংহাসনে আরোহণ করে হিন্দু রাজা শাহ হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় এভাবেই এলাকার নামকরণ রাজশাহী হয়েছে– এ মত অনেকেই গ্রহণ করেননি। রাজা গণেশ পনের শতকে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ষোল শতকে শেরশাহের আমলে সৃষ্ট ভূমিসংক্রান্ত সুবা, সরকার, পরগণা, মহাল প্রভৃতির পরিচয় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সেখানে রাজশাহী নাম দেখা যায় না। অন্যদিকে রাজা টোডরমল প্রণীত খাজনা আদায়ের তালিকায়ও নামটি অনুপস্থিত। অতএব রাজা গণেশের আমলে রাজশাহী নামকরণ না-হওয়ারই কথা। উইলিয়াম উইলসন হান্টার-এর মতে– নাটোরের রাজা রামজীবনের রাজশাহী নামে জমিদারী ছিল। রাজশাহীর কালিনাথ চৌধুরী বলেছেন,

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী, কলেজ, রাজশাহী

> পদ্মানদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে একটি ভূ-ভাগ রাজশাহী প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইংরেজদের অধিকার সময়ে বোধ হয় ঐ চাকলার নামে রাজশাহী জেলার নামকরণ হয়।[৩]

রাজশাহীতে রাজা-জমিদারগণের বসবাস বলে এমন নামকরণের কথাও অনেকে বলে থাকেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য যে, নবাবী আমলে নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩-১৭২৭ খ্রিঃ) সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা[৪]-তে বিভক্ত করেছিলেন। এসবের একটি 'চাকলা রাজশাহী' নামে পদ্মানদীর উভয় পারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই চাকলা রাজশাহীর জমিদার ছিলেন উদিত (উদয়) নারায়ণ। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং রাজশাহীর বগুড়া, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলার অধিবাসীগণ উদয় নারায়ণকে রাজস্ব দিতেন। তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হওয়ায় নবাব কর্তৃক 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। সম্ভবত রাজশাহী নামটি নবাব মুর্শিদকুলী খানেরই দেয়া। কেননা,

> মুর্শিদকুলী খান আলমগীর বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নওয়াবী লাভের পর তিনি বাদশাহ কর্তৃক উচ্চ পদবীতে ভূষিতও হইয়াছিলেন। হয়ত বাদশাহকে খুশী করিবার জন্য বাঙলার সর্ব্ববৃহৎ জমিদারীটির নাম রাজশাহী করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজা মুসলমানের বাদশাহী 'রাজশাহী'; এই দুই জাতীয় অদ্ভুত নামের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।[৫]

রাজা উদয় নারায়ণ আদায়কৃত খাজনার একটি অংশ নবাবকে দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেও অন্তরে একজন স্বাধীনচেতা সামন্তের মনোভাবই লালন করতেন। ফলে অচিরেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে তাঁরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধে উদয় নারায়ণ পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। নবাব উক্ত জমিদারী নাটোরের রাজা রামজীবনের নিকট বন্দোবস্ত দেন (১৭১৪ খ্রিঃ)। রামজীবনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র রামকান্ত রাজা হন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে রামকান্তের মৃত্যু হলে স্ত্রী ভবানী দেবী 'রাণী ভবানী' নাম নিয়ে জমিদারীতে আসীন হন। রাজশাহী নামকরণ নবাব মুর্শিদকুলী খানের রাজা উদয় নারায়ণের প্রতি স্নেহ ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রসূত বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতে, রাজশাহী রাণী ভবানীরই দেয়া নাম। অধ্যাপক গ্রান্ট-এর মতে, রাণী ভবানীর জমিদারীকেই রাজশাহী বলা হতো। বলা যায়, রাজশাহী প্রথমে ছিল একটি চাকলার নাম, তার পরে হয়েছে নাটোরের জমিদারীর নাম। বৃটিশরা প্রথমে জেলা হিসেবে রাজশাহীর নামকরণ করে এবং পরে করে বিভাগের নাম। সর্বশেষে রাজশাহী হয় একটি শহরের নাম, যে স্থানটি 'রামপুর-বোয়ালিয়া' হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রথমে নাটোরই ছিল রাজশাহীর জেলা সদর। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে সদর দপ্তর উঠে আসে রামপুর বোয়ালিয়ায়। ধীরে ধীরে রামপুর বোয়ালিয়া নামটি বাদ পড়ে রাজশাহী নামটিই স্থায়ী হয়ে যায়।

অবস্থান ও আয়তন

বরেন্দ্র অঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগ ২৩°-৪৮´-৩০´´ উত্তর ও ২৬°-৩৮´ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮°-২´ পূর্ব ও ৮৯°-৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এ স্থানের সামান্য দক্ষিণ (২৩ ও ২৪ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী স্থান) দিয়ে অতিক্রম করেছে। ৯০° পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। সুতরাং ৮৮°-২´ পূর্ব ও ৮৯°-৫৭´ পূর্ব

দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই অঞ্চলটির অবস্থানও পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যস্থলে। বরেন্দ্রর উত্তরে ভারতের পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা, পশ্চিমে পূর্ণিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর ও মালদহ জেলা, দক্ষিণে পদ্মানদীর ওপারে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলা ও বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি জেলা এবং পূর্বে ভারতের ধুবড়ি, ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে তরা জেলা ও যমুনা নদীর ওপারে অবস্থিত বাংলাদেশের জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা নিয়ে রাজশাহী বিভাগের আয়তন ৩৪৫১৩ বর্গ কিমি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৩৪২৭২৬১৬ জন। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে লোকবসতি ৯৯৩.০৩ জন।[৬]

ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবী কিংবা তার অঞ্চল বিশেষের উপরিস্থিত চিত্র তথা বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রকৃতি, উৎপত্তি, গাঠনিক উপাদান, বিন্যাস, পরিবর্তন প্রভৃতির বিবরণ। একই ভূতাত্ত্বিক গঠন ও জলবায়ুগত সাদৃশ্য সংবলিত অঞ্চলকে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল বা একক বলা হয়। স্বভাবতই একটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল পার্শ্বস্থিত আরেকটি অঞ্চল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ও ভূমিরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত টারশিয়ারি[৭] যুগের পার্বত্য অঞ্চল, প্লিস্টোসিন[৮] যুগের সোপান অঞ্চল ও নবীন যুগের প্লাবন সমভূমি– এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিস্তৃতভাবে অবশ্য ২৩ টি উপঅঞ্চল ও ৫৪ টি এককে ভাগ করা যায়। উপঅঞ্চলগুলি হল– পুরাতন হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি; তিস্তা প্লাবনভূমি; পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমি; যমুনা প্লাবনভূমি; হাওরঅববাহিকা; সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবনভূমি; মেঘনা প্লাবনভূমি- ক. মধ্য মেঘনা প্লাবনভূমি, খ. লোয়ার মেঘনা প্লাবনভূমি, গ. পুরাতন মেঘনা মোহনাজ প্লাবনভূমি, ঘ. নবীন মেঘনা মোহনাজ প্লাবনভূমি; গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমি; গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি; সুন্দরবন এলাকা; লোয়ার আত্রাই অববাহিকা; আড়িয়াল বিল; গোপালগঞ্জ-খুলনা পিট অববাহিকা; চট্টগাম উপকূলীয় সমভূমি; উত্তর ও পূর্বাংশের পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি; প্লিস্টোসিন যুগের উঁচুভূমি– ক. বরেন্দ্রভূমি, খ. মধুপুর গড়, গ. ত্রিপুরা পৃষ্ঠ ও উত্তর ও পূর্বাংশের পাহাড়সমূহ- ক. নিচু পর্বতসারি, খ. উঁচু পর্বতসারি। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও টিলাসমূহ শিলং মালভূমির দক্ষিণ বরাবর ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষে সিলেট জেলার পূর্ব ও দক্ষিণভাগে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও এসবের অসংখ্য উপনদী শাখানদী বাহিত তিনটি বৃহৎ নদীপ্রণালীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমিতে অবস্থিত। সাম্প্রতিককালে পলিজ সমভূমি দেশের মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিগত দুইশত বছরে গঙ্গা ও তিস্তার পূর্বমুখী এবং ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণমুখী প্রবাহ এই পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছে। রাজশাহী অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিচয়ে সংক্ষিপ্তভাবে এই পলিজ সমভূমির পরিচয় দেয়া যাক।

হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি: বিভিন্ন জলধারা ও নদনদী কর্তৃক হিমালয় পর্বত থেকে বাহিত পলি হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি গঠন করেছে। এ সমভূমির একটি অংশ দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত হয়েছে, যা প্রায় সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চলে বিস্তৃত। আয়তন ৩৮৭০ বর্গ কিমি। এই অঞ্চলটি হিমালয়ের পাদদেশীয় বালি ও নুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। অঞ্চলটি ধীরে ধীরে উঁচু হলে তিস্তানদী একসময় গতিপথ পরিবর্তন করে পূর্বমুখী হয়ে পড়ে। এই সমভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। এর অধিকাংশ স্থানই বন্যায় প্লাবিত হয় না।

তিস্তা প্লাবনভূমি

পশ্চিমে হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি এবং পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল। দক্ষিণে শেরপুর পর্যন্ত প্রসারিত এই অঞ্চলটি প্রাচীন তিস্তানদী গঠিত একটি প্লাবনভূমি। মোট আয়তন ১৩২৮৩ বর্গ কিমি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বর্ষামৌসুমে প্লাবিত হয়। তবে ঘাঘটনদী বরাবর একটি অগভীর অবভূমির অবস্থান রয়েছে, যেখানে বন্যার গভীরতা মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে।

গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি

গঙ্গানদী দ্বারা সৃষ্ট সক্রিয় প্লাবনভূমি ও সর্পিলাকার বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি সমন্বয়ে গঠিত। আয়তন প্রায় ২৩২১৩ বর্গ কিমি। এ প্লাবনভূমি স্থানীয় ভাবে বর্তমান ও পরিত্যক্ত নদীর গতিপথ বরাবর অনিয়মিত ভাবে গড়ে উঠেছে। সক্রিয় প্লাবনভূমিতে গঙ্গানদী প্রতিবছর বন্যার সময় অব্যাহতভাবে ক্ষয়সাধন ও নতুন চরাভূমি গঠনের মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। তবে নদীটি যমুনানদীর চাইতে কম চরোৎপাদী। প্রবাহের সময় প্রচুর পলিমাটি বয়ে আনে। অববাহিকাগুলোতে এবং অধিকাংশ শৈলশিরার মধ্যভাগে কাদামাটির প্রাধান্য রয়েছে। তবে শৈলশিরার উপরিভাগে দোআঁশমাটি এবং খুব অল্প ক্ষেত্রে বালিমাটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহী ও পাবনা জেলার কিছু অংশসহ দক্ষিণাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় এই গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির অবস্থান। ভূ-প্রাকৃতিক এই এককটির দক্ষিণে রয়েছে গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি। গোপালজঞ্জ-খুলনা পিট অববাহিকা এই প্লাবনভূমি দ্বারা তিন দিক থেকে আবদ্ধ রয়েছে।

লোয়ার আত্রাই অববাহিকা

রাজশাহী বিভাগের সবচাইতে ক্ষুদ্র ৮৫৫ বর্গ কিমি আয়তনের এই ভূ-প্রাকৃতিক এককটি আত্রাই এবং গঙ্গানদীর মিশ্র পললগঠিত নিচুভূমিতে অবস্থিত। নিচুভূমিতে অবস্থান বলে এটি ভরঅববাহিকা নামেও পরিচিত। আত্রাই নদীর উত্তর দিকের স্থানসমূহের ভূমি প্রধানত সমতল, তবে দক্ষিণ দিকের ভূ-প্রকৃতিতে শৈলশিরাসমূহ, প্লাবনভূমি ও বিস্তৃত অববাহিকা বিদ্যমান। মাটিতে ভারি কাদার প্রাধান্য রয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমের শৈলশিরাসমূহের মাটি দোআঁশ প্রকৃতির।

প্লিস্টোসিন (Pleistocene) কালের উঁচুভূমিসমূহ: পূর্বদিকে কুমিল্লার লালমাই এলাকা থেকে শুরু করে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত প্লি-

স্টোসিন চত্বর। যাকে মেঘনা ও যমুনা নদীপ্রণালী ত্রি-ধারায় বিভক্ত করায় তিনটি বিচ্ছিন্ন উত্থিতভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড় ও পশ্চিম দিকে মেঘনা প্লাবনভূমি বেষ্টিত ক্ষুদ্র আয়তনের ত্রিপুরাপৃষ্ঠ। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবনভূমির মধ্যবর্তী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার অংশবিশেষ নিয়ে অবস্থিত ৩৯৮৭ বর্গ কিমি আয়তনের মধুপুরগড়। লালবর্ণের এবং বিচিত্র কাদামাটি দিয়ে গঠিত ভূপ্রাকৃতিক এই উপএককটি দক্ষিণে রাজধানী ঢাকার প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অবস্থানে রাজশাহী বিভাগের মধ্য ও লোয়ার পশ্চিমাংশ জুড়ে ৭৩৮৭ বর্গ কিমি এলাকায় দেশের সর্ববৃহৎ ভূপ্রাকৃতিক উপএকক বরেন্দ্রভূমি। বাংলাদেশের ১১৪০১ বর্গ কিমি ভূ-ভাগ নিয়ে এই উঁচুভূমিসমূহ। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এসবের গড় উচ্চতা ২৫ মিটারেরও বেশি।

বরেন্দ্রভূমি

রাজশাহী বিভাগের ভূতাত্ত্বিক গঠনে বরেন্দ্রভূমির গুরুত্ববহ ভূমিকা রয়েছে। প্লিস্টোসিন চত্বরের এই বরেন্দ্রভূমিতে ছোট বড় অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ড রয়েছে। উত্তরে হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে মহানন্দা এবং পূর্বে করতোয়া এই চতুঃসীমা বেষ্টিত অঞ্চলে বরেন্দ্রভূমির অবস্থান। হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত পুনর্ভবা, আত্রাই ও ছোটযমুনা এই ভূপ্রাকৃতিক একককটিকে প্রধান চারটি অংশে বিভক্ত করেছে। মহানন্দা-পুনর্ভবার মধ্যবর্তী অংশটি ছাড়া অবশিষ্ট তিনটি অংশই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। বরেন্দ্রভূমির বৃহত্তম দুটি অংশের একটি আত্রাই ও পুনর্ভবা এবং অন্যটি করতোয়া ও ছোটযমুনা নদী দ্বারা বেষ্টিত। করতোয়া ছোটযমুনা বেষ্টিত অংশটির দক্ষিণদিকের অপেক্ষাকৃত পুরাতন ভাগটি মালভূমি সদৃশ। এ ছাড়া অন্যত্র ভূ-পৃষ্ঠ কিছুটা তরঙ্গাকৃতির। এই তরঙ্গায়িত এলাকার উঁচু অংশ স্থানীয়ভাবে 'ডাইং' এবং নিচু অংশ 'কান্দর' নামে পরিচিত। কান্দরের জমিগুলো অপেক্ষাকৃত উর্বর। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পূর্বের নিচুভূমি 'ভরঅববাহিকা' নামে পরিচিত। রাজশাহী ও পাবনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে এই ভরঅববাহিকার অবস্থান এবং এর কেন্দ্রভাগের এক বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকা চলনবিল নামে পরিচিত। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলার অংশবিশেষ এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। এই ভূমি সাধারণ প্লাবনভূমির তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে স্থাপিত। এই এলাকার সমোন্নতি রেখা দুইটি চত্বরতলকে নির্দেশ করে। একটি তল ৪০ মিটার উচ্চতায় এবং অন্যটি ২০ থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। এর ফলে অন্যান্য প্লাবনভূমি মৌসুমি বন্যায় প্লাবিত হলেও বরেন্দ্রভূমি সেই সময় বন্যামুক্ত থাকে।

বরেন্দ্রভূমির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বহু সর্পিলাকার নদীখাত প্রশাখী জলনিষ্কাশন প্রণালীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে প্রধান নদীগুলোতে পতিত হয়েছে। খাড়ি নামের অগভির ও সর্পিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারা দিয়েও বরেন্দ্র এলাকার নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বরেন্দ্রভূমিকে উত্তর-পূর্ব দিকে বেষ্টন করে করতোয়া নদী বরাবর ৬৪ কিমি দীর্ঘ একটি চ্যুতি বিদ্যমান রয়েছে। এই চ্যুতির মাধ্যমেই করতোয়া নদীর গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র স্রোতধারাগুলো পূর্বাংশ বিধৌত করে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটযমুনা নদীতে পতিত হয়। সতের শতক পর্যন্ত তিস্তানদী থেকে উৎপন্ন পুনর্ভবা, আত্রাই ও ছোটযমুনা দিয়ে বরেন্দ্রভূমির পানি প্রবাহিত

হতো। এই নদীগুলো গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হতো। ১৭৮৭ খিস্টাব্দের ভূমিকম্প ও প্রলয়ঙ্করী বন্যায় তিস্তা তার গতিপথ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হয়। করতোয়া, আত্রাইয়ের মিলিত স্রোতধারাও বর্তমানে যমুনা নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে।

বরেন্দ্রভূমির প্রায় ৪৭ ভাগ উঁচুভূমি, ৪১ ভাগ মধ্যমভূমি এবং বাকিটা নিচুভূমি। ঢালু ভূভাগের ৮০ ভাগ ভূমি কৃষিকাজের আওতাভূক্ত। স্বাভাবিক প্লাবনমুক্ত থাকায় বৃষ্টিই এখানকার ভূ-গর্ভস্থ পানির একমাত্র উৎস। একসময় এ অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবনমিত ভূমির অস্তিত্ব ছিল, যেগুলো সম্প্রতি কৃষিভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থার এই পরিবর্তনে একদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্নবায়ন ব্যাহত হয়েছে, অন্যদিকে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরতাও বেড়ে গেছে। আবার বিগত দুই শতকে এ অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে জলবায়ুর উপরও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভূতাত্ত্বিক রূপান্তর ক্রমান্বয়ে এলাকাটিকে একটি উষ্ণভূমিতে পরিণত করেছে।

মধুপুর কর্দম (Madhupur Clay) নামে পরিচিত প্লিস্টোসিন পলল ভিত্তির উপর বরেন্দ্রভূমি বা খিয়ারঅঞ্চল অবস্থিত। বরেন্দ্রভূমির গঠন বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর পূর্বে প্লিস্টোসিন যুগে শুরু হয়ে ১০ হাজার বছর পূর্বের হলোসিন (Holocene) যুগে ভূ-গাঠনিক আন্দোলনজনিত কারণে উত্থিত হয়ে এ ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতে, বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের অবনমনসমূহে প্লিস্টোসিন পলল সঞ্চিত হয়ে পরবর্তীকালে নিওটেকটোনিক (Neotectonic) আলোড়নের ফলে এ অঞ্চলের উঁচু চত্বর গঠিত হয়। প্রাচীনতর পললগঠিত এই ভূমি লালচে, ঈষৎ হলুদ কিংবা বাদামি রঙের এবং আঠালো ও দৃঢ়। এই উঁচুভূমি দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্যে বিভাজন করা যায়।

১. লালমাটি গঠিত প্রাচীনভূমি– লালমাটি গঠিত প্রাচীনভূমি হিসেবে পরিচিত এ ভূমির প্রায় সর্বত্র কমবেশি কাঁকর দেখা যায়। স্থানবিশেষে সরিষা থেকে মটরদানা আকৃতির জলযোজিত অম্লজানের সর্বাধিক জারক দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র বেলে পাথরের কণা (Pisolitic concreations of hydrated iron peroxide) এ মাটিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও এগুলো বড় আকারের দেখা যায়। দিনাজপুরে এ নুড়ি কবুতরের ডিমের সমান পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সদর, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর, চিরির বন্দর, বিরল, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গি প্রভৃতি থানার প্রায় সম্পূর্ণ এবং বীরগঞ্জ, খানসামা, ঠাকুরগাঁও ও অটোয়ারি থানার অংশবিশেষ লালমাটির বরেন্দ্রভূমি। রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ থানার সম্পূর্ণ এবং পলাশবাড়ি, সদর, তারাগঞ্জ, সৈয়দপুর ও নীলফামারী থানার অংশবিশেষ এ জাতীয় ভূমি দ্বারা গঠিত। করতোয়ানদীর পূর্বতীরবর্তী এলাকার গাবতলী, সারিয়াকান্দি ও ধুনট থানার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং বগুড়া সদর, শেরপুর থানার অংশবিশেষসহ করতোয়ার পশ্চিমতীরবর্তী এলাকা লালমাটিতে তৈরি। রাজশাহীতে গোদাগাড়ি, তানোর, নাচোল, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা, ধামইরহাট, মহাদেবপুর প্রভৃতি থানার সম্পূর্ণ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, মান্দা, সিংড়া, বাগাতিপাড়া প্রভৃতি থানার অংশ বিশেষে বরেন্দ্রভূমির অবস্থান এবং এ

জাতীয় মাটি দ্বারা তৈরি। পাবনার কেবল তাড়াশ থানার অধিকাংশ ও রায়গঞ্জ থানার কিছু অংশ লালমাটি দ্বারা তৈরি বরেন্দ্রভূমি।

২. পলিমাটি গঠিত উঁচুভূমি– এ ভূমি উপরের লালমাটি গঠিত প্রাচীনভূমির চাইতে কিছুটা পরবর্তী সময়ের। তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন প্রভৃতি বড় নদী ও এগুলোর অসংখ্য উপনদী শাখানদী বাহিত পলিগঠিত উঁচুভূমি। পলিমাটিতে গঠিত হওয়ায় পলি (Silt) ও বালির (Sand) সঙ্গে কাদা সংমিশ্রণের তারতম্য অনুসারে এ ভূমির মধ্যে কিছু সুক্ষ্ম রকমভেদ আছে। পলিজ বালি, পলিজ সিল্ট, পলিজ সিল্ট ও কাদা, বিলজাত পলল অবক্ষেপ ইত্যাদি নামে বিভক্ত হলেও পলিমাটি গঠিত উঁচুভূমিই বলা যায়। দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ, বোদা থানার প্রায় পুরো অংশ, আর বীরগঞ্জ, খানসামা, অটোয়ারি, ঠাকুরগাঁওয়ে অংশবিশেষে এই ভুমির অস্তিত্ব দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী রংপুর জেলার ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, তারাগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পীরগাছা, গঙ্গাচরা, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট থানার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং নীলফামারী, রংপুর, সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ি থানার কিছু অংশ এই ভূমির অন্তর্গত। বগুড়া জেলায় এ ভূমি সীমিত। বগুড়া সদর, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম থানার কিছু কিছু অংশে এ ভূমির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পাবনা জেলার সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, চাটমোহর, ঈশ্বরদী ও সদর থানার কোথাও কোথাও এই পলিমাটির উঁচুভূমি দেখা যায়। রাজশাহীতে বিস্তীর্ণ এলাকায় এই পলিমাটি গঠিত উঁচুভূমির অবস্থান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, মান্দা, সিংড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর সদর, গুরুদাসপুর থানার অংশবিশেষে এ ভূমির অস্তিত্ব আছে। এছাড়াও রাজশাহী সদর, পবা, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, চারঘাট, বাগমারা, মোহনপুর, লালপুর, রাণীনগর, নওগাঁ সদর, বদলগাছি থানা এই পলিমাটি গঠিত উঁচুভূমি। সুবিখ্যাত চলনবিল ব্যতীত বরেন্দ্রভূমির অন্যান্য বিল বিলজাত পলল অবক্ষেপ জাতীয় ভূমির অন্তর্গত।

বরেন্দ্র অঞ্চলে উল্লিখিত উঁচুভূমিদ্বয় ছাড়া বিভিন্ন নদী বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, মহানন্দা, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদীবাহিত পলি ও বালি স্তূপীকৃত হয়ে এর নিচু প্লাবনভূমি সৃষ্ট হয়েছে, যা বর্ষাকালে পানির নিচে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ ধরনের ভূমি বরেন্দ্রভূমির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত। এ ভূমিকে নব গঠিত নিম্ন প্লাবনভূমি নামকরণ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় অববাহিকার প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান ইন্ডিয়ান প্লাটফরম-এর উপর বিদ্যমান হওয়ায় বরেন্দ্রভূমি খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। কয়লা (Coal), পিটকয়লা (Peat Coal), কঠিন শিলা (Hard Rocks), চুনাপাথর (Limestone), চিনামাটি (China Clay), কাঁচবালি (Glass Sand), খনিজবালি (Mineral Sand), গ্রাভেল (Gravel), তামা (Copper) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থ। বগুড়া, রাজশাহী এবং দিনাজপুর জেলায় উন্নতমানের বিটুমিন কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। বরেন্দ্রভূমির প্লিস্টোসিন পললের নিচে প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান ভিত্তিস্তরে বিচ্ছিন্ন অববাহিকায় এই কয়লার উপস্থিতি। এই কয়লা গন্ডোয়ানা (Condwana) নামে অধিক পরিচিত পারমিয়ান (Permian) শিলাস্তরের অন্তর্গত এবং উৎকৃষ্ট মানের। প্রায় ৬০ কোটি বছরেরও অধিক

প্রাচীন আর্কিয়ান শিলা (Archian Rocks) রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। মধ্যপাড়ায় প্রাপ্ত কঠিন শিলা অতি উন্নত মানের। রাস্তা-ঘাট, সেতুসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজে এ শিলা খুবই উপযোগী। প্রায় ৬ কোটি বছরের পুরাতন ইওসিন (Eocene) যুগের চুনাপাথর বগুড়া ও রাজশাহীর বিভিন্ন কূপ থেকে উত্তোলিত হচ্ছে। উৎকৃষ্ট মানের এই চুনাপাথর সিমেন্ট তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজশাহীর পত্নীতলা ও দিনাজপুরের মধ্যপাড়া এলাকায় চিনামাটি ও কাঁচবালি পাওয়া গেছে। সিরামিক, ইলেক্ট্রিক ও বিভিন্ন শিল্পজাত সামগ্রী তৈরিতে এসব প্রয়োজন হয়। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ এলাকার খনিতে কোনো কোনো কূপে চুম্বকীয় বৈসাদৃশ্য (Magnetic Anomaly) থেকে লৌহ, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতব খনিজদ্রব্য বিদ্যমান রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও ভূমিরূপের পরিবর্তনে বরেন্দ্রভূমির পরিবেশ ক্রমঅবনতিশীল হয়ে পড়েছে। জলবায়ুগত অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্যোজনের প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত, আর তা অতিমাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় এ ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা নদীগুলোতে ইন্ডিয়া বাঁধ নির্মাণ করে শুকনো মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করায় মরুকরণ প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। এ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। নির্বিচারে বনভূমি উজাড়ও বৃষ্টিপাত হ্রাসের অন্যতম একটি কারণ। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৪৯ সালের ভূমি জরিপ তথ্য থেকে জানা যায়, এ এলাকায় ৫৫ ভাগ অংশ জুড়ে ছিল বনভূমি। ১৯৭৪ সালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ ভাগে। বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ যে আরও আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে তা বলাই বাহুল্য। তবে আশার কথা হচ্ছে– সম্প্রতি এলাকাটি ভূগর্ভস্থ পানির উন্নয়ন এবং কৃষিকাজের জন্য একটি নিম্ন সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পানির জন্য কৃষকদের কেবল মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপরই নির্ভরশীল থাকতে হতো। সারাবছর একটি ফসলই ছিল তাদের একমাত্র প্রাপ্তি। ফলে খাদ্যঘাটতি সম্পন্ন এলাকা হিসেবেই বরেন্দ্র বিবেচিত হত। উল্লিখিত সমস্যা মোকাবেলায় সরকার ভূ-গর্ভস্থ পানির নতুন নতুন উৎস সন্ধানে এবং সেই পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আশির দশকে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষিকাজের উন্নয়নে Barind Integrated Area Development Project নামে একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় শুষ্কমৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে তিন হাজারেরও অধিক গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। ফলে এতদঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং এলাকাটি খাদ্যউদ্বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। পরিবেশ অবক্ষয় রোধে একই প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণ এবং পুকুর ও খালখনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত অন্যান্য স্কিমও ইতিবাচক অবদান সৃষ্টি করে। এভাবে পনের বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ব্যাপক সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই উক্ত প্রকল্পটির বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Barind Multipurpose Development Authority) নামকরণ হয়। এর আওতায় বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার গভীর নলকূপ সেচ সুবিধা প্রদান করছে। অবশ্য ব্যাপক হারে উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বহু নিচে

নেমে গেছে। এছাড়াও এই পানিতে দ্রবিভূত নানা খনিজ পদার্থ মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা বিনষ্ট করছে। এমনিতেই এই এলাকার মাটি নীরস বলে ফলন কম। তদুপরি উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন এই সেচ ব্যবস্থায় প্রান্তিক চাষীরা লাভবান হচ্ছে সামান্যই। সর্বোপরি আশঙ্কাজনক ভাবে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়গত বিষয়গুলো প্রকটতর হচ্ছে। সুতরাং একটি সমন্বিত পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই এলাকার উন্নয়ন করা না হলে ভূ-গর্ভস্থ পানিনির্ভর এই প্রকল্পটি দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। এমনকি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

পরিবেশ পরিচিতি

রাজশাহী বিভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি এলাকায় অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এ অঞ্চলের সামান্য দক্ষিণে অবস্থান করছে। জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও আদ্র। এ অঞ্চলের দক্ষিণপ্রান্ত সমুদ্র থেকে প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে, আবার মধ্যাংশ হিমালয় থেকে দক্ষিণে প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত। ফলে রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণাংশের জলবায়ু কিছুটা আদ্র এবং হিমালয়ের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ ও আদ্রতা, তাপমাত্রার তারতম্য, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আবহাওয়াবিদগণ এ অঞ্চলের আবহাওয়াগত অবস্থাকে ১. প্রাকমৌসুমি (আংশিক বসন্ত ও আংশিক গ্রীষ্মকাল), ২. মৌসুমি (আংশিক গ্রীষ্ম, সমগ্র বর্ষা ও আংশিক শরৎকাল), ৩. মৌসুমিউত্তর (আংশিক শরৎ ও আংশিক হেমন্তকাল) ও ৪. শীতঋতু (আংশিক হেমন্ত, সমগ্র শীত ও আংশিক বসন্তকাল) এই চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিকের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে এবং এ সময় কিছুটা শীতের প্রকোপ অনুভূত হয়। এই ঠাণ্ডা বাতাস মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত বয়ে চলে। এর পরে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর কিছু কিছু এলাকায় পশ্চিম দিক থেকে গরম লু-হাওয়া বইতে থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বইতে দেখা যায়। অবশ্য এ সময় মাঝেমধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ‘কালবৈশাখী’ নামের প্রবল ঝড় বয়ে যায়। প্রাকমৌসুমি কালের এই বায়ু পরে মৌসুমিবায়ুতে রূপান্তরিত হয়ে জৈষ্ঠ্যের শেষ থেকে শুরু করে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এলাকাভেদে কিছু ভিন্নতা থাকলেও বরেন্দ্র অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে বাতাসের আদ্রতা প্রায় সমভাবাপন্ন। মৌসুমিবায়ু প্রবাহ শুরু হলে বাতাসের আদ্রতা ৮৪ ভাগ থেকে ৯৬ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত হয়। কার্তিকের শুরু থেকে নিম্নমুখী হতে থাকে। শীতকালে অনেক সময় ৬৭ ভাগ পর্যন্ত নেমে আসে। অতীতে সর্বনিম্ন আদ্রতা ১৬ ভাগ এবং সর্বোচ্চ ১০৬ ভাগ পর্যন্ত দেখা গেছে। সাধারণত এ অঞ্চলে বাতাসের গড় আদ্রতা সর্বনিম্ন ৫৭ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ৮৬ ভাগ এর মধ্যে অবস্থান করে।

আবহাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের চরমভাবাপন্ন স্থানগুলোর কয়েকটি রাজশাহী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার তাপমাত্রার মূলগত কোন পার্থক্য না থাকলেও কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সচরাচর ২৫° থেকে ৩৫° এবং শীতকালে ১২° থেকে ১৫° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। তবে গ্রীষ্মে কোনো কোনো বছর দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী

জেলার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৫° পর্যন্ত উঠে যায়। রাজশাহীর লালপুরে ৪৭° পর্যন্ত উঠার রেকর্ড রয়েছে। তেমনিভাবে শীতকালে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৫° এরও নিচে নেমে যায়। অর্থাৎ গ্রীষ্মে অত্যধিক গরম এবং শীতে অত্যধিক ঠাণ্ডাই হচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলের আবহাওয়ার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে তুলনামূলক কম হয়, আবার বিভিন্ন এলাকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা যায়। দিনাজপুর ও বগুড়া এলাকায় গড়ে ১৮১৩ মিমি, রংপুরে ২৩২৪ মিমি, পাবনায় ২২০০ মিমি এবং রাজশাহীতে ১৭০৫ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে কয়েক বছরের রেকর্ডে দেখা গেছে। এতে সমগ্র বিভাগে গড়ে ১৯৭১ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছিল বলে ধরা যায়। স্থানভেদে এবং কোনো কোনো বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণেও পার্থক্য হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের রেকর্ড অনুযায়ী বরেন্দ্র অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ছিল ১৭৩৮ মিমি, কিন্তু ১৯৯২ সালে এসে তা দঁড়ায় মাত্র ৭৯৮ মিমি-তে। ইতোমধ্যেই রাজশাহীকে খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নদ-নদী

নদী বাংলাদেশের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বড় বড় নদী। এসবের সঙ্গে মিশেছে ছোট-বড় অনেক উপনদী। আবার এসব নদী-উপনদী থেকে অসংখ্য স্রোতধারার অগণিত শাখাপ্রশাখা বের হয়ে ছুটে চলেছে সমুদ্র অভিমুখে। ক্ষুদ্র আয়তনের এই ভূ-খণ্ডে এত বেশি সংখ্যক নদনদী জলাশয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের অপরূপ নিসর্গ বিনির্মাণে নদীগুলোই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জনজীবন তথা অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি-সভ্যতাসহ অনেক বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই নদীর মাধ্যমে। বাঙালির চিরন্তন পরিচয় 'মাছে ভাতে বাঙালি' প্রবাদের মূল সুরটিও এই নদীর সঙ্গেই গ্রথিত! অন্যদিকে অনেক নদীই সময়ের ব্যবধানে, নৈসর্গিক প্রভাবে কিংবা কৃত্রিম কারণে তার নাব্যতা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কখনও বা গতিপথ বদলিয়ে ভয়ঙ্কর হিংস্রতা দিয়ে ধ্বংস করেছে সবকিছু। বিলীন হয়েছে সমৃদ্ধ জনপদ। বাস্তুহারা হয়েছে হাজারও মানুষ। বাংলাদেশ উজান থেকে নেমে আসা নদীসমূহের সঙ্গমস্থল। উত্তর ভারত আর আসামের সমতলভূমি বেয়ে নেমে আসা বড় নদীগুলো অসংখ্য উপনদী শাখানদীসহ বর্ষাকালে বিপুল জলরাশি নিয়ে সবেগে বয়ে চলে দক্ষিণে। স্রোতের তোড়ে এ সময় শুরু হয় নদীর তীরভাঙ্গনের পালা। দুই কূল ছাপিয়ে পানি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বন্যায় তলিয়ে যায় ফসলাদি, জনপদ। দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে অধিবাসীদের জীবন। এমনিভাবে ভাঙ্গা-গড়া, উন্নতি-দুর্গতির স্বাক্ষরে নদী তার আপন বহমান ইতিহাসে বাংলাদেশে চিরভাস্বর হয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রসঙ্গত রাজশাহী অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদ-নদীসমূহের পরিচিতি দেয়া হলো।

গঙ্গা-পদ্মা: গঙ্গা ভারত ও বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নদীপ্রণালীগুলোর অন্যতম। গঙ্গা হিমালয় পর্বতমালার গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নির্গত ভাগীরথী এবং নন্দাদেবী শৃঙ্গের উত্তরে গাঢ়োয়াল অঞ্চল থেকে উৎপন্ন অলকানন্দা উপনদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতধারা থেকে সৃষ্ট। এই স্রোতধারা হরিদ্বারের সমভূমিতে পৌঁছে

রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে রাজশাহীর পশ্চিমাংশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে গোয়ালন্দঘাটের কাছে যমুনানদীর সঙ্গে একীভূত হয়েছে। আরও ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে মেঘনানদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গার সমগ্র প্রবাহপথ 'পদ্মা' নামে অভিহিত হলেও যমুনা থেকে মেঘনা পর্যন্ত অংশটির নামই পদ্মা। যমুনার মিলনস্থল পর্যন্ত গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য ২৬০০ কিমি। তার মধ্যে বাংলাদেশ অংশে ২৫৮ কিমি। আর গোয়ালন্দঘাট থেকে চাঁদপুরে মেঘনানদীর সঙ্গে মিলন পর্যন্ত পদ্মার দৈর্ঘ্য ১২০ কিমি। বাংলাদেশে নদীটির একমাত্র উপনদী মহানন্দা, তবে শাখানদী বহুসংখ্যক; যেসবের মধ্যে রয়েছে বড়াল, ইছামতি, নবগঙ্গা, ভৈরব, কুমার, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়ালখাঁ প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র যমুনাঃ ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের দীর্ঘতম নদীসমূহের অন্যতম নদী। বস্তুত ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান দক্ষিণমুখী প্রধান স্রোতধারাই যমুনা নামে অভিহিত। তিব্বতের মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বতের মধ্যবর্তী পার্খা নামক স্থানের অদূরে চেমায়ুংদুন হিমবাহ থেকে নদীটির উৎপত্তি। চীন, তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশের ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে এর বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চল। কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পদ্মার সঙ্গে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নদীটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২৭০০ কিমি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ব্রহ্মপুত্র যমুনার মিলিত দৈর্ঘ্য ২৭৬ কিমি, যমুনার দৈর্ঘ্য যেখানে ২০৫ কিমি। ব্রহ্মপুত্র-যমুনার চারটি প্রধান উপনদী রয়েছে। এগুলো দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা ও আত্রাই-করতোয়া নদীপ্রণালী। শাখানদীগুলোর মধ্যে এক সময়ের মূল স্রোতধারাবাহী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রই প্রধান।

তিস্তাঃ তিস্তা উত্তরাঞ্চলের প্রধান নদীগুলোর একটি। নদীটির বাংলা নাম তিস্তা এসেছে ত্রি-স্রোতা বা তিন প্রবাহ থেকে। হিমালয় পর্বতমালার ৭২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত চিতামু হ্রদ থেকে নদীটির সৃষ্টি। দার্জিলিং জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নীলফামারী জেলার খড়িবাড়ি সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জলপাইগুড়ি থেকে এটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বতন প্রবাহটি ছিল করতোয়া, পশ্চিমেরটি পুনর্ভবা, আর মধ্যবর্তীটি আত্রাই নদী। আঠারো শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিস্তা বিভিন্ন প্রবাহের মাধ্যমে গঙ্গানদীতে প্রবাহিত হতো। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে ত্রিস্রোতার মূলপ্রবাহ পুরনো খাত ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্ববাহী হয়ে লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলমারী নদীবন্দরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। সেই থেকে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী। নদীটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩১৫ কিমি। তার মধ্যে বাংলাদেশে ১১৫ কিমি।

করতোয়াঃ করতোয়া উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদকে দীর্ঘতম ও বৃহত্তম উপনদী হিসেবে গণ্য করা হয়। নদীটি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরের একটি জলাশয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগরের অবস্থান

করতোয়ার তীরেই। এখনও নদীটি মহাস্থানগড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তমানে মৃতপ্রায় হলেও নদীটি এককালে ছিল প্রশস্ত ও বেগবতী। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় তিস্তার সঙ্গে নদীটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মূল স্রোতধারা হারিয়ে খর্বকায় হতে থাকে। ধীরে ধীরে কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নদীটির উত্তর অংশকে দিনাজপুর-করতোয়া বলা হয়। বর্তমানে এই নদী দিয়ে সামান্যই পানি প্রবাহিত হয়। সৈয়দপুর জেলার কাছে রংপুরকরতোয়ার আরম্ভ। সেখান থেকে গোবিন্দপুর উপজেলা হয়ে কাঁটাখালি এবং শিবগঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাঙালি নদীতে পড়েছে। শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রবাহিত অংশে বছরের অধিকাংশ সময় প্রায় পানিশূণ্য থাকে। এ অংশটি রংপুরকরতোয়াকে বগুড়াকরতোয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। বাঙালিনদী ফুলঝোরনদী হয়ে বাঘাবাড়ির কাছে হুরাসাগর নদীতে পড়েছে। শেষের অংশটি পাবনাকরতোয়া নামে পরিচিত। বেড়া পুলিশ স্টেশনের কাছে হুরাসাগর ডান দিকের ইছামতি নদীর প্রবাহ ধারণ করে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। এভাবে নদীটি দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পথে যুক্ত হয়েছে ছোটবড় অনেক উপনদী শাখানদী। উত্তরাঞ্চলের অনেক ছোট ছোট নদীও করতোয়া নামে পরিচিত হয়েছে। করতোয়া নদীপ্রণালীর মোট দৈর্ঘ্য ৫৯৭ কিমি। গড় বিস্তার ২০০ মিটার ও গভীরতা ৭ মিটার।

আত্রাই: আত্রাই তিস্তার মধ্যবর্তী শাখানদী। দিনাজপুর জেলার খানসামার উত্তরে এ নদী করতোয়া নামে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে বুড়িতিস্তার সঙ্গে মিশে আত্রাই নাম ধারণ করেছে। চিরিরবন্দর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে নদীটি বিভক্ত হয়ে এই বন্দরেরই দক্ষিণ-পশ্চিমে আবার মিলিত হয়ে দিনাজপুর শহরের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ভুষিরবন্দর ও সমঝিয়াঘাট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর অতিক্রম করে নওগাঁর সীমানা দিয়ে নদীটি পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে নদীটি মধ্যবরেন্দ্র ভূমিকে দুইভাগ করে মান্দা উপজেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। ফেরিঘাট এলাকায় এটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে মোড় নিয়ে চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করতোয়ার সঙ্গে একীভূত হয়েছে এবং উভয়ের মিলিত স্রোতধারা গিয়ে পড়েছে বেড়া থানার কাছে হুরাসাগর হয়ে মূল যমুনানদীতে। বৃহত্তর রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলে আত্রাইয়ের একাধিক শাখানদী রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ফকিরনী, তুলসীগঙ্গা, নন্দকুয়া, শিব-বারনই ইত্যাদি। এ নদীগুলো আবার নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৮০ কিমি।

ছোটযমুনা: ছোটযমুনা নদীও তিস্তার পূর্বতন প্রবাহগুলোর একটি। ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে উদ্ভূত নদীটি দক্ষিণমুখী হয়ে দিনাজপুর জেলার পূর্ব ও বগুড়া জেলার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একসময় নদীটি বেশ প্রশস্ত ছিল। দিনাজপুর জেলায় এর উপত্যকা বেশ সংকীর্ণ, তবে হিলির নিকটে এর অববাহিকা যথেষ্ট প্রশস্ত। যমুনা থেকে পৃথক করার জন্যই নদীটির নাম ছোটযমুনা হয়েছে। বরেন্দ্রভূমির পূর্বভাগ নিষ্কাশনকারী তুলসীগঙ্গা ও চিরি নদী ছোটযমুনা নদীর প্রধান দুটি উপনদী।

নাগর: বগুড়া জেলার শিবগঞ্জের নিকট করতোয়া নদী থেকে বের হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে, পরে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সিংড়াতে আত্রাই নদীতে পড়েছে। নাগরের একটি উপনদী উত্তরভাগের উঁচুভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, মূলত এটিই নাগরের উৎস। সর্পিল গতিপথে প্রবাহিত নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ১০৫ কিমি।

শিব ও বারনই: শিব নদীটি মান্দাবিলে আত্রাইনদী থেকে নির্গত হয়ে আন্দাসুরা, হিলনা, কুমারী বিলের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে। তানোরের বাগধানী এলাকা অতিত্রম করে নওহাটার দুয়ারির নিকট নদীটি বাঁক নিয়ে পূর্বমুখী হয়েছে এবং এখান থেকে বারনই নামে নামকরণ হয়েছে। বারনই প্রথমে পূর্বে এবং পরে উত্তরপূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বাগমারার ভবানীগঞ্জের নিকট আত্রাইয়ের অপর শাখানদী ফকিরনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বেলঘরিয়ায় মুসাখান নামে একটি উপশাখা বের হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আড়ানির নিকট বড়াল নদীতে পড়েছে।

বড়াল: বড়ালনদী গঙ্গার বাম তীরের একটি শাখানদী। নদীটি রাজশাহী জেলার চারঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে বের হয়ে নাটোর ও পাবনা অতিক্রম করে প্রথমে আত্রাইয়ের সঙ্গে মিশেছে এবং পরে শাহজাদপুরের দক্ষিণে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে হুরাসাগর হয়ে যমুনায় পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় এই বড়ালনদীর বহুবার উল্লেখ করেছেন। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ১৪৭ কিমি, গড় প্রস্থ ১২৫ মিটার ও গভীরতা প্রায় ৬ মিটার। কেবল বর্ষা মৌসুমেই নদীটি পদ্মার পানিতে গতিশীল হয়। অন্য সময় চলনবিল ও বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল থেকে প্রবাহ পায়।

ইছামতি: গঙ্গার বাম তীরের আরেকটি শাখানদী। নদীটি পাবনা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে বের হয়ে শহরের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বেড়া থানার পাশ দিয়ে হুরাসাগরে পড়েছে। বর্তমানে নদীটির উজানে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। এটি কেবল নিষ্কাশন খাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহানন্দা: মহানন্দা গঙ্গার একমাত্র উপনদী। হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী মহালড্রিম পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়ে কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ি অতিক্রম করে দিনাজপুরের তেঁতুলিয়ার নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর থেকে বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিনাজপুর ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ভোলাহাটের কাছে আবারও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে বামদিকে রেখে আরও বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে গোদাগাড়ির মাটিকাটায় পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মহানন্দা একসময় প্রশস্ত ও গভীর নদী ছিল। বর্তমানে সেই নাব্যতা আর নেই। ভারত সরকার উজানে আন্তঃসীমরেখার মাত্র ৩ কিমি দূরে শিলিগুড়ির কাছে ব্যারেজ নির্মাণ করে নদীটির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ রুদ্ধ করেছে। মহানন্দার আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৩৬০ কিমি।

পুনর্ভবা: ঠাকুরগাঁও-এর বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার নিম্নভূমি থেকে নদীটি উৎপন্ন হয়েছে। নদীটির প্রধান উৎস ব্রাহ্মণপুর বরেন্দ্রভূমি। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পুনর্ভবা ঢেপানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যা করতোয়ার একটি শাখানদী। দিনাজপুর শহরের ঠিক দক্ষিণে

নদীটি পশ্চিম ও পশ্চিমকেন্দ্রিক বরেন্দ্রভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর নদীবিধৌত ভূমির প্রশস্ততা ৩ থেকে ৮ কিমি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রোহনপুরের দক্ষিণে এটি মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ১৬০ কিমি। পুনর্ভবার টাঙ্গন, নাগর এবং কুলিক নামের তিনটি উপনদী রয়েছে। টাঙ্গননদী পঞ্চগড় জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে মালদহ জেলা হয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। শেষে এটি রোহনপুরের নিকট পুনর্ভবায় মিলিত হয়েছে। টাঙ্গননদীর রয়েছে একটি সুরক্ষিত নদীবিধৌত ভূমি, যা পর্বত পাদদেশের সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। নাগর পশ্চিমবঙ্গ এবং পঞ্চগড়ের অটোয়ারী ও সদর উপজেলার সীমানার মিলনস্থলের কাছাকাছি আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি সীমান্তনাগর নামেও পরিচিত। প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ঠাকুরগাঁও-এর হরিপুরের কাছে নদীটি আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। নদীর গতিপথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারত বাংলাদেশের সীমানা নির্দেশ করেছে। বাংলাদেশ অংশে নদীটি ১২৫ কিমি দীর্ঘ। শুষ্কমৌসুমে তেমন পানি থাকে না, তবে বর্ষা মৌসুমে কৃষকেরা বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে সেচের কাজে ব্যবহার করে।

বিল জলাশয়

রাজশাহী অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও পরিচয়ে প্রচুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। কোথাও হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি, কোথাও প্লাবনভূমি, কোথাও বা প্লিস্টোসিন কালের উঁচু বরেন্দ্রভূমি– যেখানে রয়েছে কাদা-কাঁকর মিশ্রিত শক্ত লালমাটি কিংবা বালি-পলিমাটি অথবা বিলজাত পলিমাটি। রয়েছে নবগঠিত নিম্ন প্লাবনভূমি, নানা অববাহিকা। আলোচনার এই অংশে এ অঞ্চলের বিল-জলাভূমির পরিচয় দেয়া যাক– যেগুলো বিলজাত পলল অবক্ষেপ জাতীয় ভূমির অন্তর্গত।

নাম জানা-অজানা অসংখ্য বিল জলাশয় রাজশাহী অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ভোলাহাট থানার ভাটিয়া বিল, পোরশা থানার বড় মির্জাপুর বিল, গোদাগাড়ি থানার পালতোলা বিল উল্লে-খযোগ্য। রাজশাহী এলাকার অন্যান্য বিলের মধ্যে রয়েছে চাকচাকি, ছাবুল, ঘুকড়ি, ঘুকুশি, কাকন, মান্দা, শোভাডাঙ্গা, সিদ্ধেধর, ঘানা, উতরাই, হিলনা, আন্দাসুরা, কালীগ্রাম, কুমারী, সোনা, বাগশিমলী, মালঞ্চী, আজুম, আঙরা, পেদ্দা, সেউতি, গোস্তী, পারুল, সোনাইকান্দা ইত্যাদি। দিনাজপুরে উল্লেখযোগ্য একমাত্র বিল ভোমরাদহ। রংপুর সদরের লানিপাঁকের বিল, পীরগঞ্জের বড়বিলা, বদরগঞ্জের চাপড়া বিল, কুড়িগ্রামের টোগরাই বিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যর মধ্যে রয়েছে ককরুল, চিকলি, হাড়িশর, পোড়া বুকশোলা, চাওড়া ইত্যাদি। বগুড়ার আদমদিঘী থানার রক্তদহ বিল, বগুড়া সদর ও শিবগঞ্জ থানার সোমরাইল, কালিদহ, দাঁড়িদহ, সুবিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলার দুলাইয়ের দক্ষিণে ১২৩ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে গাজনাবিল সর্বাপেক্ষা বড় বিল। এ এলাকার অন্যান্য বিলের মধ্যে বেড়া, দিকতী উল্লেখযোগ্য।

চলনবিল: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সমৃদ্ধতম জলাভূমি চলনবিল। উপমহাদেশের আর কোথাও এমন বিশাল বিলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার

অংশবিশেষ নিয়ে বিলটির অবস্থান। চলনবিল বিভিন্ন নদী নালা খাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত বহুসংখ্যক ছোট-বড় বিলের সমন্বিত নাম। বর্ষাকালে এগুলো একাকার হয়ে প্রায় ৩৬৮ বর্গ কিমি আয়তনের একটি বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়। বিলটির সৃষ্টি কতদিন আগে, কেনই বা চলনবিল নামকরণ– তার কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে কয়েক হাজার বছর পূর্বেও এই অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল বলে মনে করা হয়। হতে পারে, পরবর্তী সময়ে চলনবিলকে জন্ম দিয়ে সমুদ্র ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে গেছে। সে সময় তিস্তা ও গঙ্গা অববাহিকা এবং আরও পরে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণগামী যমুনার স্রোতধারাসমূহের কিছু অংশ এই চলনবিলকে ধারণ করে প্রবাহিত হয়েছে। এই বিলের জলরাশি বদ্ধ বা স্থির না থেকে সর্বকালেই বিভিন্ন নদী-নালার স্রোত দ্বারা গতিশীল ছিল। বিধায় বিলটির নামকরণ হয়েছে চলন্তবিল বা চলনবিল। নাটোরের সিংড়া, গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়ার আংশিক (রামকৃষ্ণপুর, উধুনিয়া, সলঙ্গা, বাঙ্গালা, বড় পাঙ্গাসী ইউনিয়ন) এবং পাবনার ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর থানা নিয়ে চলনবিলের অবস্থান। এককালে তৎকালীন নাটোর মহকুমার তিন-চতুর্থাংশ, নওগাঁর রাণীনগর ও আত্রাই থানা, বগুড়া জেলার আদমদিঘী ও নন্দীগ্রাম থানা, সিরাজগঞ্জের অধিকাংশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর, ফরিদপুর, শাহজাদপুর ও বেড়া থানাসহ চলনবিল অঞ্চলের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ১২৮০ বর্গ কিমি এলাকায়। কেবল বিলভূমির আয়তনই ছিল ৮৮০ বর্গ কিমি। কিন্তু আত্রাই-করতোয়ার মাধ্যমে উত্তরাংশ এবং গঙ্গা অববাহিকায় দক্ষিণ অংশ দীর্ঘ সময় ধরে পলি জমে ক্রমশ উঁচু হওয়ায় এবং মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বিলটি বর্তমানে একেবারেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আত্রাই, বড়াল, করতোয়া, নন্দকুজা, ভাসানী, ভদ্রাবতী, গুড়, গুমানী, গোহালা, ফুলঝোর, তুলসী, চেঁচুয়া, চিকনাই, বানগঙ্গা, বিলসূর্য, কুমারডাঙ্গা প্রভৃতি ছোট-বড় নদী এবং অসংখ্য খাল, খাড়ি, জোলা (ছোট খাল) চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। খালসমূহের মধ্যে রয়েছে– সাত্তার সাহেবের খাল, নিয়ামত খাল, হক সাহেবের খাল, কিনু সরকারের খাল, পানাউল্লা খাল, নিমাইচরা খাল, ভাসানী গুমানী খাল, নূরপুর খাল, হরদমা খাল, উলিপুর-মাগুরা খাল, দোবিলা খাল, কিশোরখালি খাল, গাঁড়াবাড়ি-ছারুখালি খাল প্রভৃতি। এছাড়া বাঁকাই খাড়ি, বেহুলার খাড়ি, নবির হাজীর জোলা, হরদমার জোলা, বৈদ্যমরিচ জোলা, মহিষালহাট জোলা, বাঁইড়া বিলের জোলা, জানিগাছার জোলা প্রভৃতি বহু খাল-জোলা চলনবিলবাসী নিজেদের প্রয়োজনে খনন করে নিয়েছে। বিলগুলো হচ্ছে– পূর্বমাধনগর, পিপরুল, ডাঙ্গাপাড়া, চিরল, লারোল, নিয়ালা, চলন, তাজপুর, মাঝগাঁও, বিরিয়াশো, চোনমোহন, শাতাইল, খরদহ, ঘুঘুদহ, দারিকুশি, কাজীপাড়া, গাজনা, বড়বিল, সোনাপাতিলা, কুরলিয়া, দীক্ষি এবং গুরকা।

প্রায় পনর লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই চলনবিল অঞ্চলে রয়েছে একটি পৌরসভা, সাতান্নটি ইউনিয়ন এবং দেড়হাজারেরও অধিক গ্রাম। এ বিলের গঠন প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবেই আত্রাই ও বড়াল নদীর সংকোচন প্রসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে। আত্রাই নদী বৃহত্তর রাজশাহী জেলার উত্তরাংশ ও দিনাজপুর এলাকার পানি বয়ে এনে চলনবিলে ফেলে। আর গুড়, গুমানীসহ অন্যান্য নদী-খালের মাধ্যমে সেই পানি প্রথমে বড়বিলে এবং পরে বড়াল নদীর দ্বারা নিষ্কাশিত হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হয়। বর্তমানে চলনবিল দ্রুত ভরাট হয়ে

যাচ্ছে এবং বিলের ধারে গড়ে উঠছে গ্রাম। বিলটির কেবল মূল অংশ ছাড়া শুকনো মৌসুমে প্রায় সমস্ত বিলই শুকিয়ে যায়। এ সময় সমগ্র বিল এলাকায় বোরো ধান চাষ করা হয়। পঞ্চাশের দশকে চলনবিলের জমি পুনরুদ্ধারে নানা কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ সময় অনেকগুলো খাল খনন করে জলাবদ্ধতা নিরসনের ফলে জমিগুলো আবাদি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীতে খুব অল্প পরিমাণ জমিতে কেবল আমন ধানেরই আবাদ হত। অগভীর জলাভূমিতে গাছ বন্যার পানিতে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠায় সক্ষম– এমন কয়েক প্রজাতির সরু, সুগন্ধি ধানের চাষ হত। ইদানীং আমন মৌসুমের পাশাপাশি অন্যান্য মৌসুমেও চাষাবাদ হচ্ছে। বিশেষত বোরো মৌসুমে সেচ সুবিধার আওতায় প্রচুর ধানচাষ হচ্ছে। একসময় চলনবিল মৎস্য সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রবাদই ছিল– মাছের ডিপো চলনবিল। এখানকার সুস্বাদু নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও পাঠানো হত। গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কোটি কোটি টাকার মাছ বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। যদিও মাছের সেই সুদিন আর নেই, তবুও রাজশাহী অঞ্চলের মাছের চাহিদা পূরণে চলনবিল এখনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

তথ্যসূচি:

---

[১] ভাতুরিয়া– ভাতুরিয়া বর্তমানে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম। তবে এটিই রাজা গণেশের ভাতুরিয়া কি-না সন্দেহ হয়। কারণ, তাঁর মত পরাক্রমশালী একজন জমিদারের কোন স্মৃতিচিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না। প্রচলিত কোনো জনশ্রুতিও অনুপস্থিত। তবে উত্তরবঙ্গের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে ভাতুরিয়া নামে চিহ্নিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অঞ্চলটি উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে পদ্মানদী, পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা-পুনর্ভবা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে সরকার বাজুহার অন্তর্গত বাহসুড়িয়া বা বাহুড়িয়া নামে একটি মহালের উল্লেখ আছে। ভাতুরিয়া হয়ত উক্ত নামেরই রূপান্তর। প্রাচীন দলিলপত্রেও নামটি দেখা যায়।

[২] J.A.S.B ১৮৭৬ P-২৮৭

[৩] শ্রী কালিনাথ চৌধুরী: *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ.২

[৪] চাকলা– ফারসি ‘চকলাহ্’ শব্দের রূপান্তর। কয়েকটি পরগণার একত্রীকরণ, জেলা। সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় (প্রাদেশিক অঞ্চল) বিভক্ত ছিল। এগুলোর একটির নাম– ‘বঙ্গালহ্’। এ সুবাটিকে আবার ২৪টি সরকারে (জেলার সমতুল) ভাগ করা হয়েছিল। সরকার গঠিত হত কতগুলো পরগণা নিয়ে। একটি পরগণায় থাকত বহুসংখ্যক গ্রাম। রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে সম্রাট শাহজাহান কয়েকটি পরগণা নিয়ে একটি চাকলা গঠন করেন।

[৫] কাজী মোহাম্মদ মিছের: রাজশাহীর ইতিহাস, ১৯৬৫ পৃ-৯

[৬] “2011 Population & Housing Census: Preliminary Results.” –Bangladesh Bureau of Statistics

[৭] টারশিয়ারি (Tertiary)– চার থেকে সাত কোটি বছর পূর্বের ভূ-তাত্ত্বিক সময়কে টারশিয়ারি বা নবজীবীয় যুগ বলা হয়।

[৮] প্লিস্টোসিন (Pleistocene)– পৃথিবীর বয়স বিশ থেকে পঁচিশ কোটি বৎসর বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। এই সুদীর্ঘকালকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলোর একটির নাম– সেনোজোয়িক। সেনোজোয়িক যুগও আবার পাঁচ পর্বে বিভক্ত। এগুলো হল– ইওসিন, ওলিগোসিন, মাইওসিন, প্লাইওসিন ও প্লিস্টোসিন। আঠার থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বের সময় প্লিস্টোসিন যুগ।